বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খ- ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দলিলের জে-ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা

প্রতিমা পাল-মজুমদার*

১.১। ভূমিকা

বিশ্ব থেকে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক নির্ধারণ করে ২০০০ সালে জাতিসংঘ ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millenium Development Goal (MDG)) ধার্য্য করে যা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ২০১৫ সাল। বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের জন্য গঠিত কাউন্ট্রি টিম যৌথভাবে এই দলিল গ্রহণ করেছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছিল। এখন ২০১২ সাল। আর মাত্র তিন বছর সময় আছে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়মীমা অতিক্রান্ড় হওয়ার। MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশ কতটুকু এগিয়েছে, তা তলিয়ে দেখার এখনই উপযুক্ত সময়। দেখা গেছে, গত এক দশকে বেশ কয়েকটি লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশ যথাযথভাবে এগিয়ে গেছে। MDG দলিলের একটি প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কারণ গত এক দশকে চরম দরিদ্রদের (১৮০০ ক্যালরীর নিচে যাদের খাদ্যমান) হার ২৮ শতাংশ থেকে নেমে ৯ শতাংশে পৌঁচেছে। MDG'র দ্বিতীয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার প্রদান করা। এই লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জনেও বাংলাদেশের সফলতা রয়েছে। বর্তমানে ৯৫ শতাংশেরও বেশি স্কুল গমনোপযোগী শিশু প্রাইমারী শিক্ষায় তালিকাভুক্ত হয়েছে। তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রাটি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুর-ষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য এবং অসমতা দূরীভূত করা এবং নারীকে ক্ষমতায়িত করা। এই লক্ষ্যটি অর্জনে কয়েকটি বিষয়ে যেমন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জে-ার বৈষম্য প্রায় পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গেছে। প্রতিটি জাতীয় হিসাবে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির ব্যাপারে জে-ার ফারাকটি একেবারে মুছে গেছে। কোনো কোনো এলাকায় দেখা গেছে, পুর-ষ শিশুর চাইতে নারী শিশুর তালিকাভুক্তিই বেশি হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোনো কোনো এলাকায় দেখা গেছে, নারী শিশুর তালিকাভুক্তি পুর-ষ শিশুর চাইতে বেশি। গত এক দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করে বেশ কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীর জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প গ্রহণ করার ফলেই এই সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তবে এই প্রকল্পের ফলে জে-ার অসমতাটি উল্টোমুখী হতে আরম্ভ করেছে। তাই গত দুই বছর ধরে জাতীয় বাজেটে দরিদ্র পুর-ষ শিশুকেও উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। একমাত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্র হতেই জে-ার অসমতা কিংবা জে-ার বৈষম্য দূরীভূত হওয়ার ব্যাপারে তেমন অগ্রগতি হয়নি। তেমনিভাবে দেখা গেছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেরও কিছু কিছু বিষয়ে, যেমন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা, রোগ প্রবণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জে-ার সমতা অর্জনে অগ্রগতি হলেও অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে, বিশেষ করে পুষ্টির বিষয়ে জে-ার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

হয়েছে সামান্যই। তাছাড়া সম্পদের ক্ষেত্রে, চাকুরি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা এবং জেন্ডার বৈষম্য।

MDG'র আরও একটি জরুরি জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দারুণভাবে পিছিয়ে আছে। MDG'র ৫ নং লক্ষ্যমাত্রাটি ছিল মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) ২০১৫ সালের মধ্যে প্রতি লাখে ৫৭০ জন (১৯৯০ সালে) হতে নামিয়ে ১৪৪ জনে আনতে হবে। কিন্তু গত ১০ বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় এই হার ২০০৭ সালে ৩৫১ জনে পৌঁচেছে। মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের প্রবণতা একই রকম থাকলে কোনোভাবেই ২০১৫ সাল নাগাদ এই হার ১৪৪ জনে পৌঁছাবে না। কেন বাংলাদেশে MDG'র জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি, তার উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধটিতে। দেশের জাতীয় বাজেট MDG'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কি ভূমিকা রেখেছে এবং কতটা সফল ও ব্যর্থ হয়েছে তা মূল্যায়ন করারও প্রয়াস থাকবে বর্তমান প্রবন্ধটিতে। কেননা যেকোনো জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নির্ভর করে জাতীয় বাজেটে সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কি কি রাজস্ব এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার উপর। পরিশেষে আগামী বাজেটে (২০১২-১৩) এই লক্ষ্যমাত্রা দুটি অর্জনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি তা সুপারিশ করার প্রয়াস থাকবে।

১.২। তথ্যের উৎস এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি

MDG'র লক্ষ্য দুটির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে জাতীয় বাজেট কতটা সফল এবং ব্যর্থ হয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য অত্যন্ড় সরল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, গত ১০ বছর (২০০২/০৩-২০১১/১২)-এর জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য কত বরাদ্দ করা হয়েছে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নারী উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বাজেটের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া চেষ্টা করা হয়েছে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্প আদৌ জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক কিনা এবং এসব প্রকল্প জাতীয় জেন্ডার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিশ্লেষণ করার। গত ১০ বছরের জাতীয় বাজেট ছাড়া তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা হতে, নারীর উন্নয়ন এবং MDG সম্বন্ধীয় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক দলিল হতে। জেন্ডার অসমতা দূরীকরণ এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও মাতৃমৃত্যু সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গবেষণার ফল, বিশেষ করে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সঙ্ঘ (BNPS) নামক একটি NGO কর্তৃক সম্পাদিত একটি গবেষণার ফল এই সমীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে।

গত ১০ বছর (২০০২/০৩-২০১১/১২)-এর জাতীয় বাজেটের প্রতিটি ক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ এবং প্রকল্প প্রকৃতি যথাযথ ছিল কিনা।

১. *নারী অন্ধ প্রকল্প:* এই প্রকল্পগুলো হতে এই মূহুর্তে নারী কোনো সুবিধাই পাচ্ছে না। অবশ্য নারী যখন সর্বদিক হতে পুরুষের সমকক্ষ হবে তখন ঐ প্রকল্পগুলো হতে সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

২. *কেবল নারীকে লক্ষ্য করে গ্রহণ করা প্রকল্প:* এই প্রকল্পগুলো হতে কেবল নারীগণই সুবিধাভোগ করতে পারবে।

৩. *নারী সংবেদনশীল প্রকল্প:* এই প্রকল্পগুলো এমন প্রকৃতির যার ফলাফল নারী পুরুষ উভয়েই ভোগ করতে পারে। অবশ্য ক্ষমতার বিচারে পুরুষ যেহেতু নারীর চাইতে বেশি ক্ষমতাশীল সেহেতু স্বাভাবিকভাবে পুরুষই এই প্রকল্পগুলো হতে বেশি ফল ভোগ করবে যদি না নারীর জন্য আলাদা করে ভাগ থাকে।

পুরো বিশেণ্ডষণকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করে এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম অংশে প্রতিবেদনের পটভূমি, উদ্দেশ্য এবং তথ্যের উৎস তুলে ধরে দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য এবং জেন্ডার ফারাকের একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করা হয়েছে বাংলাদেশে MDG'র জেন্ডার অসমতা দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করার। জাতীয় বাজেট এই লক্ষ্য অর্জনে কতটা সহায়ক ভূমিকা রেখেছে তা বিশেণ্ডষণ করারও প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই অংশে। প্রতিবেদনটির তৃতীয় অংশে মাতৃমৃত্যু হারের গতি প্রকৃতির একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে MDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ কতটা সফল হয়েছে তার মূল্যায়ন করা। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের MDG'র লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য গত ১০ বছরের জাতীয় বাজেটে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং তা মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে কতটা সহায়ক হয়েছে তারও একটি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় অংশে। চতুর্থ অংশে চেষ্টা করা হয়েছে বাজেটীয় পদক্ষেপগুলোতে কি কি দুর্বলতা ছিল তা চিহ্নিত করার। সর্বশেষ অংশে MDG'র লক্ষ্যমাত্রা দুটিতে পৌঁছার জন্য কি ধরনের বাজেটীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কিছু সুপারিশ প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার অসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের একটি চিত্র এবং জাতীয় বাজেটের ভূমিকা

জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে MDG'র একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেন্ডার অসমতা দূর করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সব স্তরে জেন্ডার অসমতা দূর করা। বাংলাদেশের জন্যও একই লক্ষ্যমাত্রা এবং একই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। MDG দলিলে নারীর ক্ষমতায়ন একটি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হলেও এই লক্ষ্যের কোনো মাত্রা কিংবা সূচক নির্ধারণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবশ্য অকৃষি ক্ষেত্রে নারীর নিয়োজন বৃদ্ধি এবং জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যায় নারীর অংশ বৃদ্ধিকে দুটি সূচক হিসাবে নির্ধারণ করেছে। কিন্তু জেন্ডার অসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন এই দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এই বিষয়টি বহুমাত্রিক এবং বহুব্যাপ্তিক। তাই নারীর ক্ষমতায়ন নির্ণয়ের জন্য এই দুটি ক্ষেত্রের বাইরের ক্ষেত্রগুলোতে কি ব্যাপ্তিতে জেন্ডার অসমতা বিদ্যমান তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

গত এক দশকে বিভিন্ন বাজেটীয় পদক্ষেপের ফলে দুএকটি ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা অনেক সঙ্কুচিত হয়েছে এবং দু'একটি ক্ষেত্রে দূরীভূতও হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই অসমতার ব্যাপ্তিও কমেছে। আবার একই ক্ষেত্রের নিম্ন স্তরের অসমতা দূর হলেও উচ্চ স্তরে এই অসমতা প্রকটভাবে রয়ে

গেছে। আবার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডার অসমতার নতুন নতুন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, তথ্যপ্রযুক্তি আজ একটি বিরাট ক্ষেত্র যা দশ বছর পূর্বে এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আজ এই ক্ষেত্রটি ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উৎস। কিন্তু সেখানে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা। তেমনিভাবে গত কয়েক দশকে মহিলাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক উদ্যোক্তাগোষ্ঠী। কিন্তু জাতীয় বাজেটে উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহীত সব সুবিধাই গ্রহণ করা হয়েছে পুরুষ উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য করে। ফলে উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে জেন্ডার অসমতা যা দূরীকরণের জন্য কেবল নারী উদ্যোক্তাকে লক্ষ্য করে বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। আজ পরিবেশ দূষণ দারিদ্র্যের এক বিশেষ মাত্রা। এখানেও সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা এবং জেন্ডার বৈষম্য। তাই সময়ের অতিক্রমনে জেন্ডার অসমতা এবং জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্র এবং প্রকৃতি বদল হয়েছে এবং এই অসমতার নতুন নতুন ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়েছে। এখানে জাতীয় বাজেটে জেন্ডার অসমতা এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বরাদ্দ রাখা একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়া জরুরি। এই সবগুলো বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সমীক্ষাটির এই অংশে বাংলাদেশে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য এবং জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে বাংলাদেশ কতটা সফল হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কেননা এই চিত্রটি তুলে ধরার উপরই নির্ভর করছে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য যথাযথ বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.১। দারিদ্র্য ভোগে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার ব্যাপ্তি এবং অসমতা দূরীকরণে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা

MDG দলিলের প্রথম লক্ষ্যমাত্রাটি হলো ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা। পূর্বেই উলেণ্ডখ করা হয়েছে, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তবে দেশের নারী ও পুরুষ সমানভাবে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায়নি। গৃহভিত্তিক আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES)-এর তথ্য থেকে দেখা যায়, দেশের সার্বিক দারিদ্র্য যেখানে ১৬ শতাংশ লাঘব হয়েছে সেখানে নারীদের দারিদ্র্য লাঘব হয়েছে ৯ শতাংশ। HIES প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারের মহিলারা তার সমগোত্রীয় পুরুষদের চাইতে অনেক কম ক্যালরী গ্রহণ করে। দরিদ্র পরিবারের মহিলা সদস্যরা প্রতিদিন ৭৭২.০৭ ইউনিট ক্যালরী গ্রহণ করে যেখানে তাদের সমগোত্রীয় পুরুষ সদস্যরা গ্রহণ করে ১১৪৩.১৮ ইউনিট ক্যালরী। দারিদ্র্য বিমোচনে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতার ব্যাপ্তির একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে জাতিসংঘের হিসাবকৃত জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক থেকে। কেননা ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উৎপাদক হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন।

আজ দারিদ্র্য অবস্থায় পরিবেশগত দারিদ্র্য এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তবে MDG দলিলে দারিদ্র্যের এই মাত্রাটি তেমনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে কেবল নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়নিষ্কাশনে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে শহরের শতভাগ এবং গ্রাম অঞ্চলের ৯৬.৫ ভাগ লোকের নিরাপদ খাবার পানিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল বাংলাদেশের জন্য। এই লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জনে বাংলাদেশ শহর অঞ্চলে এগিয়ে থাকলেও গ্রাম অঞ্চলে অনেক পিছিয়ে আছে আর গ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশি। তাছাড়া শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে নিরাপদ খাবার পানি দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে বস্তি এলাকাগুলোতে নিরাপদ পানীয় জল সংগ্রহ করতে বস্তিবাসী নারীদের যেমন খরচ হয়

অর্থ তেমনি খরচ হয় তাদের সময় ও শারিরীক শক্তি। উন্নত পয়নিষ্কাশন সুবিধায় প্রবেশাধিকারের ব্যাপারেও একই চিত্র রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়নিষ্কাশনে প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে ব্যাপক জোর অসমতা রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য পরিবেশগত দারিদ্র্য ভোগেও রয়েছে ব্যাপক জোর অসমতা। দেখা গেছে, বাংলাদেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি শিকার হন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে উদ্ভূত সমস্যাগুলোও পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি ভোগ করেন। আর্সেনিক সমস্যা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা। এই সমস্যার শিকারও নারীরাই বেশি হচ্ছে। অথচ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এই সত্যগুলো বিবেচেনায় গ্রহণ করা হয় না। দু'একটি Safety net প্রকল্প গ্রহণ করা ছাড়া পরিবেশগত দারিদ্র্যে জোর অসমতা দূর করার জন্য অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা ও সন্ত্রাস বাংলাদেশের দারিদ্র্যের আর একটি বিশেষ মাত্রা যা MDG'তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ অনেক ক্ষেত্রে আয় দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দারিদ্র্য ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা থেকে উত্থিত হয় এবং এই সত্যটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর জন্য প্রযোজ্য। কেননা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিরাপত্তাহীনতার কারণে নারীকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছে, চাকুরি ছাড়তে হয়েছে, উন্নত চাকুরির অফার ছাড়তে হয়েছে, এমনকি এই সমস্যা বহু ক্ষেত্রে নারীকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বিরত রেখেছে। জোর অসমতা দূর করার জন্য দারিদ্র্যের এই মাত্রাটির অপসারণ জরুরি। নীতিনির্ধারকদের এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে যে অনেক নিরাপত্তাহীনতা নারী এককভাবে ভোগ করেন। যেমন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানী, যৌতুকের শিকার, নারী পাচার ইত্যাদির শিকার প্রায় এককভাবে নারী হয়। এসব ছাড়াও আছে নারীর উপর এসিড নিক্ষেপ, ছিনতাইকারী কর্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি। দেখা গেছে, অন্যান্য নিরাপত্তাহীনতা থেকেও নারীরাই বেশি ভোগেন। যেমন, গার্মেন্ট কারখানায় অগ্নি দূর্ঘটনায় পুরুষ শ্রমিকের চাইতে নারী শ্রমিকরাই বেশি আহত এবং নিহত হয়েছেন। নারীর এই ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করে নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১০ বছরের বাজেট বিশেণ্ডষণ থেকে দেখা যায়, এসিড দগ্ধ নারীদের জন্য একটি প্রকল্প এবং যৌন হয়রানীর শিকার নারীদের জন্য কিছু চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা ছাড়া আর অন্য তেমন কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

২.২। সম্পদ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতার ব্যাপ্তি এবং অসমতা দূরীকরণে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা

অর্থ সম্পদ, তথ্য সম্পদ, স্থাবর সম্পদ, মানব সম্পদ এই প্রতিটি সম্পদই একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি উৎপাদক। এই প্রতিটি সম্পদেই বাংলাদেশের নারীর প্রবেশাধিকার অতি সীমিত। মানব সম্পদের একটি অংশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেই কেবল নারী প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং পুরুষের সঙ্গে সমতা অর্জন করেছে। আর কোনো সম্পদেই বাংলাদেশের নারীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ কিংবা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যার ফলে সম্পদ মালিকানা এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে বিরাট অসমতা। এই অসমতাই অন্যান্য জোর অসমতার জন্য দায়ী। তাই বাংলাদেশে জোর অসমতার শিকড় সম্পদ মালিকানায় এই বিরাট জোর অসমতা মধ্যে নিহিত আছে আর এই শিকড়টি উপড়ে ফেলার উপর বহুলাংশে নির্ভর করছে জীবনের সব ক্ষেত্রে জোর সমতা অর্জন। উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত বলেই প্রধানত এই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র

এখনও পর্যন্ড় কোনো উত্তরাধিকার আইন তৈরি করেনি। যার ফলে ধর্মীয় আইনেই বাংলাদেশে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়। মুসলিম আইনে একজন পিতার পুর"ষ সন্ড়ান তার সম্পত্তির যত অংশ পাবে তার নারী সন্ড়ান পাবে সেই অংশের অর্ধেক। মুসলমান জনগোষ্ঠী মোট বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০ শতাংশ জুড়ে আছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ। হিন্দুদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী নারী সন্ড়ানগণ পিতার সম্পত্তির এক কানাকড়িরও অংশীদার নয়। এই ধরনের বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনের কারণে ভূমি সম্পদে (জমি, বাড়ি, বনসম্পদ, পুকুর, দীঘি, জলাশয়) নারীর প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ অতি সীমিত হয়েছে। ভূমি সম্পদে অতি সীমিত নিয়ন্ত্রণের কারণে অন্যান্য সম্পদেও নারীর প্রবেশাধিকার অতি সীমিত হয়ে পড়েছে। যেহেতু অন্য সম্পদে, যেমন কৃষি ঋণ, গৃহ ঋণ, শিল্প ঋণ ইত্যাদি পেতে হলে collateral প্রদান জর"রি, ভূমি সম্পদে মালিকানা না থাকার কারণে নারীরা collateral প্রদান করতে সমর্থ হয় না। ইদানীং বাংলাদেশ ব্যাংক নারীকে collateral বিহীন ঋণ প্রদানে বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নানা নীতি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে ঋণ কর্মকা"ে জে"ার সমতা অর্জন বিষয়ে অর্ধবাৎসরিক বিবরণ প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ড় এ ব্যাপারে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে ঋণ প্রাপ্তিতে জে"ার ফারাক সঙ্কুচিত হয়েছে সামান্যই। এই কারণে সম্পদে নারী ও পুর"ষের মধ্যে বৃহৎ অসমতা রয়েই গেছে।

রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটে নারীকে লক্ষ্য করে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু গত ১০ বছরের জাতীয় বাজেট বিশেণ্ডষণ করে দেখা গেছে দুস্থ ও দরিদ্র নারীর জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করা ছাড়া নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার জন্য তেমন কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আজ নারীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক উদ্যোক্তাগোষ্ঠী যাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতা। কিন্তু এই নারীগোষ্ঠী তাদের এই সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারছে না নানা ধরনের সম্পদের অভাবে। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় এই সম্ভাবনাময় নারীগোষ্ঠীটিকে কখনোও বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি। গত কয়েকটি অর্থবছরের বাজেটে অবশ্য SME খাতকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে SME সার্ভিস সেন্টার খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এং সঙ্গে সঙ্গে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখতে হবে এবং নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার হবে ১০ শতাংশ। তবে এর পূর্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জণ্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যথেষ্টভাবে উৎসাহিত করা যায়নি। অথচ ব্যবসায়ের সর্বক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তারা পুর"ষ উদ্যোক্তাদের চাইতে যেহেতু অনেক পেছনে পরে আছে সেহেতু জাতীয় নীতি অনুসরণ করে নারীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়ে বা positive discrimination করে SME ক্ষেত্রে কিছু করনীতি এবং ঋণনীতি গ্রহণ করা যেতো। এই ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে জন্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ কর উৎসাহ (tax incentive) প্রদান করা যেতো। নারীর জন্য একটি পৃথক ব্যাংক স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন উৎস হতে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রবাহ উৎসাহিত করার জন্যও কর উৎসাহ (tax incentive) দেওয়া জর"রি ছিল।

গত তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপটি কার্যকর হলে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। কেননা গ্রামগঞ্জ পর্যন্ড় বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে নারীর সময়ের উপর এক বিরাট ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং গ্রামীণ পুরষের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ নারীর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। তবে সবচাইতে বেশি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক বাজেটীয় প্রস্ড়াবটি হলো, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ সৌর প্যানেলের উপর প্রযোজ্য শুল্ক কর হ্রাস করে মূল্য শূন্য (০) শতাংশ করার প্রস্ড়াব। এই প্রস্ড়াবটি নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। এলপি গ্যাসের উপর প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্ড়াবটিও নারীবান্ধব। তাছাড়া রান্নার জ্বালানি হিসাবে এলপি গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং এর মূল্য হ্রাস করার বাজেটীয় পদক্ষেপও নারীকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করবে।

২.৩। শিক্ষা, দক্ষতা এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারী ও পুরষের মধ্যে অসমতার ব্যাপ্তি এবং অসমতা দূরীকরণে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা

নিজেকে ক্ষমতায়িত করার জন্য একজনের যতগুলো গুণের প্রয়োজন তার মধ্যে শিক্ষা একটি অতি শক্তিশালী জীবন গুণ। ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সবগুলো গুণই নারী অর্জন করতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর উৎপাদনশীলতা, তাদের উপার্জন, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এমনকি তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়নের উপরও শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, যতই নারী শিক্ষা গ্রহণ করেছে ততই তার নিজের উপর আস্থা বেড়েছে যা কিনা ক্ষমতায়নের অপরিহার্য গুণ। এই গুণ অর্জনের কারণে নারী অন্য ক্ষেত্রে, যেখানে রয়েছে ব্যাপক জোর বৈষম্য সেখানে অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোগী হবে আর জোর বৈষম্য দূরীকরণে নারীর নিজস্ব উদ্যোগ একটি অতি জরুরি উৎপাদক। নারীর শিক্ষা যে কেবল নারীকেই ক্ষমতায়িত করে তা নয়, সমাজকেও ক্ষমতায়িত করে অনেকাংশে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্ম হার কমেছে; শিশুর রোগ প্রবণতা কমেছে; শিশুকে টিকা দেওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে; শিশু সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে; পরিবারগুলোতে নিরাপদ পানি গ্রহণ করা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যমে নারী কেবল নিজেই ক্ষমতায়িত হচ্ছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জোর বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করছে তাই নয়, শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজেরও নানা মঙ্গল সাধিত হচ্ছে।

নারী শিক্ষার বহুমাত্রিক প্রভাব বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং নারী শিক্ষার জন্য নীতি প্রণয়ন করেছিল এবং জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল প্রথম দিকে। ধীরে ধীরে নারীর agency role কিছুটা স্বীকৃতি পায় নীতি নির্ধারকদের কাছে। যার ফলে একজন ব্যক্তি নারীকে শিক্ষিত করার জন্য বেশ কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় গত এক দশকের জাতীয় বাজেটে, যার মধ্যে রয়েছে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ড় নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা, দশম শ্রেণি পর্যন্ড় নারী ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ ইত্যাদি। যার ফলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় জোর বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে এবং এখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে জোর বৈষম্য দূরীকরণে MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বলে MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্বন্ধীয় বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রতিবেদন (progress report)-এ উলেণ্ডখ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা বাজেট বিশেণ্ডষণ করে দেখা গেছে, নারীর শিক্ষা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষায় যা নারীকে যথেষ্টভাবে ক্ষমতায়িত করে না। দেখা গেছে, এবতেদায়ী মাদ্রাসায় (প্রাথমিক স্ড়রের মাদ্রাসা) ছাত্র সংখ্যার তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা

বৃদ্ধি পাওয়ার হার অত্যন্ড় বেশি। গত ৫ বছর সময়ের মধ্যে মাদ্রাসায় ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৭ শতাংশ যেখানে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। এই তথ্য এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মেয়েরা বেশি সংখ্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই ইঙ্গিতটি আরও স্পষ্ট হয় যখন ফাজেল এবং কামেল মাদ্রাসায় ছাত্রী ভর্তির হার বিচার করা হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, গত ৫ বছর সময়ের মধ্যে ফাজেল এবং কামেল মাদ্রাসায় ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ যেখানে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র প্রায় ২ শতাংশ। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পুর"ষের জন্য বিশেষ করে নারীর জন্য চাকুরির বাজার অত্যন্ড় সীমিত। দেখা গেছে, পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রটি নারীর সম্মুখে এক বিরাট চাকুরির বাজার খুলে দিয়েছে সে ক্ষেত্রে একজন নারী শ্রমিকও নেই যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। তবে ২০০৯-১০ সালের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ঘোষিত শিক্ষা নীতিতেও এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতি কার্যকর করা অতি জর"রি। কিন্তু গত দুই বছরে এই নীতি কার্যকর করার জন্য কোনো লক্ষণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্ড়রে ভর্তি তালিকায় জে"ার অসমতা দূরীভূত হলেও শিক্ষা সমাপ্তিতে রয়ে গেছে বিরাট জে"ার ফারাক। তাছাড়া শিক্ষার উচ্চতর স্ড়রে রয়েছে ব্যাপক জে"ার অসমতা যা MDG'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে অপসারণ অসম্ভব। দেখা গেছে, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে নারী ছাত্রের অংশ যথাক্রমে ৬৪ শতাংশ ও ৩৬ শতাংশ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ফারাকটি আরও বিস্ড়ৃত হয়েছে দক্ষতা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বেলায়। দেখা গেছে, সারা পৃথিবীর গার্মেন্ট প্রস্তুতকারী দেশগুলোর নারী শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের দক্ষতা সবচাইতে কম। পৃথিবীর শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় জয়ী হতে হলে বাংলাদেশের নারী গার্মেন্ট শ্রমিকদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা অতি জর"রি। অথচ এই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। নারীগোষ্ঠীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা ও প্রফেশন্যাল শিক্ষার অভাব রয়েছে ব্যাপকভাবে। অথচ এইসব শিক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জে"ার পার্থক্য দূর করার জন্য জর"রি উৎপাদক। বাংলাদেশের মোট অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে বিরাট জে"ার ফারাক। এই ফারাক ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক। এই বয়সের নারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন যেখানে এই বয়সের পুর"ষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭১ শতাংশ অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। অথচ এই জনগাষ্ঠীটিই সবচাইতে বেশি কর্মক্ষম। এই সমস্ড় কারণে গত দশ বছরে বাংলাদেশের জে"ার উন্নয়ন সূচক (GDI)-এর তেমন উন্নতি ঘটেনি। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের জে"ার উন্নয়ন সূচক (GDI) ০.৫৩৬। এই সূচক প্রকাশ করছে বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠী পুর"ষগোষ্ঠীর মানব উন্নয়নের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পিছিয়ে আছে।

শিক্ষার উচ্চতর স্ড়রে ব্যাপক জে"ার অসমতার কারণে নারীর ক্ষমতায়নও দার"ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। বাংলাদেশের নারীদের কারিগরি শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে নারী উদ্যোক্তারা কোনো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না। যার ফলে তাদের ব্যবসায়ের উৎপাদনশীলতাও খুব কম। উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার কারণে তাদের আয়ও কম। আবার আয় কম হওয়ার কারণে সঞ্চয়ও কম। সঞ্চয় কম হওয়ার কারণে তাদের পুঁজি সৃষ্টি কম এবং পুঁজি সৃষ্টি কম হওয়ার কারণে তাদের পুনর্বিনিয়োগ কম। এই চক্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ের তেমন কোনো

প্রসার লাভ ঘটেনি যার ফলে তারা পুরুষ উদ্যোক্তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি এবং এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক ব্যাপক জেন্ডার ফারাক।

আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা অতি জরুরি। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষমতায়নের একটি জরুরি শর্ত। গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রীর উপর শূন্য শুল্ক ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল ছিল। শূন্য শুল্কের কারণে কম্পিউটারের সুলভ প্রাপ্যতা নারীর কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধি করে তাদের তথ্য সম্পদে প্রবেশ করাকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া computer literacy নারীকে IT sector-এ প্রবেশের ক্ষেত্রেও সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের, যারা বাংলাদেশের মোট নারীগোষ্ঠীর প্রায় ৮০ শতাংশ তাদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারণ গ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগ বালিকা বিদ্যালয়েই কম্পিউটার নেই। বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য নারীগোষ্ঠী দাবী তুলে আসছে বহুদিন ধরে। সে লক্ষ্যে আজও কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূলে রয়েছে এই দাবীটির পূরণ। ICT center গ্রাম অঞ্চলে স্থাপন করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ বসানোর কাজ সম্পন্ন হতে চলেছে। তবে এই প্রযুক্তি দক্ষভাবে ব্যবহৃত হবে না যদি মেয়েরা কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়। কারণ, সারা পৃথিবীতে ICT center এবং Call center-এ মেয়েরাই চাকুরি করে। তাছাড়া এই centerগুলো নারীকে ক্ষমতায়িত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। কেননা নানা সামাজিক কারণে নারীর চলিষ্ণুতা (mobility) সমস্যা সঙ্কুল ছিল বলে তাদের পক্ষে তথ্য সম্পদ অর্জন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। দেখা গেছে, গ্রামগঞ্জের নারীকে মোবাইল ফোন নানাবিধ তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। প্রথমত, মোবাইল ফোনের সহায়তার কারণে তারা এখন বিদেশে কর্মরত আত্মীয়স্বজনের পাঠানো remittance নিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন না। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা সঠিকভাবে জেনে যান কখন, কোথায় এবং কত টাকা স্বামী/পুত্র/আত্মীয়স্বজন তাদের কাছে পাঠাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানে কোথায় স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায়, কোথায় নালিশ জানাতে হবে ইত্যাদি। সবচাইতে বড় যে তথ্যটি তারা পাচ্ছেন তা হলো, কৃষি সম্বন্ধীয় তথ্য। এক্ষেত্রে আরও বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোবাইল ফোন প্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশ আরও সহজ করা জরুরি।

৩.৪। শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণে জেন্ডার অসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের নারী গৃহ ও কৃষি শ্রমে পূর্ণভাবে নিয়োজিত। তারা বিভিন্ন কুটির শিল্পেও ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। কিন্তু তাদের এই ব্যাপক শ্রম স্বীকৃত নয় যেহেতু এই দীর্ঘ শ্রমের বিনিময়ে তারা দৃশ্যত কোনো অর্থ উপার্জন করেন না। ফলে তারা ক্ষমতায়িতও নন। অথচ শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উৎপাদক। সমাজ ধরে নিয়েছে নারীর স্নান, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি কাজের মতো এই কাজগুলোও তাদের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ। তাই শ্রম শক্তি জরিপে তারা অন্তর্ভুক্ত হননি এবং তারা শ্রমহীনভাবে চিহ্নিত হয়েছেন। এই শ্রমহীন জনগোষ্ঠীকে শ্রমশক্তিতে আনয়নের জন্য গত তিন দশকে নানা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর নিয়োজন বৃদ্ধি করার জন্য গত এক দশকে জাতীয় বাজেটে ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক এবং অন্যান্য এনজিও ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে উপার্জনকারী কর্মে নারীর নিয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রপ্তানিমুখী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করার পর বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজনের ক্ষেত্রে এই শিল্প একটি স্বর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে বাংলাদেশের নারীর কাছে। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য

হতে দেখা যায়, গত দুই দশকে পুরুষদের শ্রমশক্তিতে অংশ গ্রহণের হার যেখানে প্রায় স্থির হয়ে আছে সেখানে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৫.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৩৬.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (Preliminary Draft Report of Labour Force Survey 2010)।

MDG'র লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে অকৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। কিন্তু ২০০৫-০৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য হতে দেখা যায়, গত ১০ বছরে অকৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১ হতে দেখা যাচ্ছে মৎস্য চাষেও নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষি ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে নারীর উপর ন্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু জমিতে মালিকানা না থাকার কারণে নারী এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুফল পাচ্ছেন না।

নারীকে উচ্চ লাভজনক কর্মের সুযোগ প্রদানের জন্য এবং উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর মধ্যে জেন্ডার অসমতা দূর করার জন্য সরকার কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যার ফলে নারীগোষ্ঠী কর্মজগতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। BCSIC-এর উপর একটি ক্ষুদ্র স্তরের জরিপের ফলাফল হতে দেখা যায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অঞ্চলে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তার মাত্র ৩.৮ শতাংশের মালিক হচ্ছেন নারী। এই অঞ্চলের আরও ৩.৮ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের যৌথ মালিকানা রয়েছে। অথচ BCSIC অঞ্চলে স্থাপিত শিল্পগুলোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেমন ক্ষুদ্র পুঁজি, সরল প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি নারীকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করে কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে তারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে এই নারীবান্ধব শিল্প অঞ্চলটিতে প্রবেশ করতে পারেনি।

সারণি ১

১৯৯৫-১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫-০৬ সালে বিভিন্ন শ্রম ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে হ্রাস ও বৃদ্ধির হার

শ্রম ক্ষেত্র	পুরুষ	নারী	উভয়
কৃষি, শিকার এবং বন	-৪.২৩	-৯.৩২	-০.৩৩
মৎস্য চাষ	-৩.৭৪	১১৯.১৮	১.৬০
খনি	১৮.০৭	৯১.২৯	-২৪.৬৪
উৎপাদন শিল্প	১৪.১৮	-৮.৭০	৬.৩৫
পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ	-৬.৭৪	-২৭.৮৮	-৮.১২
নির্মাণ শিল্প	-০.৫৬	২.৩৫	-০.৩৭
পাইকারী ও খুচরা ট্রেড, মোটরযুক্ত যানবাহন মেরামত, মোটর,	৪.৩৯	২৩.৪৮	৫.১৮
হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট	৭.৬৪	১৫.৬২	৮.১৪
পরিবহন, যোগাযোগ ও স্টুরেজ সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড	৯.৩৭	৩৮.২১	৯.৬৬
অর্থ ও মধ্যস্থতাকরণ (intermediations)	২৪.৩২	৮২.২৪	৩১.৪৯
স্থাবর সম্পত্তি, ভাড়া এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড	৬.৮৬	১৬.২৬	৭.২০
জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-৪.৮৪	৬.৯৬	-৩.৭১
শিক্ষা ক্ষেত্র	৩.৬০	২.৫৫	৩.২৯
স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্র	-১২.২৮	-৫.৮১	-১০.৪৪
অন্যান্য সামাজিক, ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি সেবা	১৩.৩৪	-১১.৮৫	০.৯৫
সব ক্ষেত্র	১.৫২	৪.৬৩	২.২৩

উৎস: Labour Force Survey 2005-06।

মন্তব্য: - চিহ্নটি হ্রাস প্রকাশ করছে।

অকৃষি খাতে অংশগ্রহণের পর নারীর কী কী প্রয়োজন হতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে জাতীয় বাজেটে নারীর কর্ম সহায়ক সুবিধা প্রদানের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে

অকৃষি খাতে নিয়োজিত নারীর জীবনে নানা ধরনের ঝুঁকি যুক্ত হয়েছে। যেমন, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, দূর্ঘটনা ঝুঁকি, নানারূপ সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর ঝুঁকি ইত্যাদি। এসমস্ত ঝুঁকির কারণে নারী কর্ম জগতে টিকে থাকতেই পারে না। নানা শারীরিক এবং মানসিক পঙ্গুত্ব নিয়ে সে অতি শীঘ্র শ্রম বাজার হতে বিদায় নেয়।

৩.৫। সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন

সংসদের মোট আসন সংখ্যায় নারীর অংশ বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়নের একটি সূচক হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল MDG'তে। তবে সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধি পেলে যে কেবল নারী ক্ষমতায়িত হবে তাইই নয়, ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে গোটা নারীগোষ্ঠীর জন্য। কারণ দেশের উচ্চতম নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দেশের জাতীয় সংসদ আর এই উচ্চতম প্রতিষ্ঠানটিতে যথেষ্ট পরিমাণে নারীর প্রতিনিধিত্বের অভাবের কারণে এখানে কখনই নারীর সুবিধা, অসুবিধা, নারীর প্রয়োজন, নারীর দাবী ইত্যাদি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় না। সংসদ অধিবেশনগুলোর আলাপ আলোচনা হতে লক্ষ করা গেছে, কোনো পুরুষ সাংসদই তার এলাকার নারীর প্রয়োজনের কথা, তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন না। সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিভিন্ন মন্ত্রী ও সাংসদ নারীর জন্য বরাদ্দকৃত উন্নয়ন অর্থ নিয়ে কোনো বিতর্ক করেন না। নারীর উন্নয়নের উপর বিভিন্ন রাজস্ব পদক্ষেপের কি প্রতিক্রিয়া পড়বে সে সম্বন্ধেও কোনো দিন কোনো আলোচনা হয়নি মহান সংসদে। তাই MDG'তে সংসদের মোট আসন সংখ্যায় নারীর অংশ বৃদ্ধি করাকে নারীর ক্ষমতায়নের একটি সূচক হিসেবে ধার্য করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

১৯৭৫ সাল হতে (যে সাল হতে মেয়েদের আসন সংরক্ষিত হয়েছে) কিছুদিন আগ পর্যন্ত ৩০ জন করে নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কিন্তু সম্প্রতি সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নারীগোষ্ঠী অতি সামান্যই পেয়েছে এই মনোনীত সংসদ সদস্যদের কাছ হতে। কারণ তারা কেউই নারীর সুবিধা, অসুবিধাগুলো কিংবা নারীর চাহিদাগুলো সংসদে তুলে ধরতে পারেননি। মনোনীত নারী সাংসদদের তৃণমূল নারীর সঙ্গে অতি সামান্যই যোগাযোগ আছে বিধায় তারা এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেননি। মনোনীত নারী সাংসদদের কেউই নারীর চাহিদা অনুযাযী বাজেটারী বরাদ্দ দাবী করেননি। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পার্লামেন্টে নারী সাংসদরাই নারীর চাহিদাগুলো পার্লামেন্টে তুলে ধরছেন। এই সাংসদদের তৎপরতায় সেখানে একটি Parliamentary Committee on Empowerment of Women হয়েছে। এই কমিটিই আজ সেখানে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

গত এক দশকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মাত্র ৭ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। গত সাধারণ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছেন। মনোনীত নারী সদস্যের সংখ্যাও ৩০ থেকে ৫০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছেন নারী। তবে সংসদের মোট আসন সংখ্যা বিচারে এখনও নারীর অংশ নিতান্তই নগণ্য। এক্ষেত্রে মনোনয়ন দানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর নারীর প্রতি বৈষম্য একটি কারণ হলেও নারীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলো যেমন, শিক্ষা, দক্ষতা, সম্পদে প্রবেশ শক্তি, তথ্যে প্রবেশ শক্তি, সর্বোপরি স্বাধীনভাবে চলাচলের শক্তি ইত্যাদি গুণগুলোর অভাব একটি বড় কারণ। আর এই গুণগুলো অর্জনের জন্য নারীকে সহায়তা প্রদান করতে পারে বিভিন্ন বাজেটীয়

পদক্ষেপ যা গত ১০ বছরের জাতীয় বাজেটে যথেষ্টভাবে গ্রহণ করা হয়নি, যদিও ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন জাতীয় উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করা হবে এবং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা হবে। এছাড়া তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন, এসব আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে যোগ্য নারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ অব্যাহত রাখার ঘোষণাও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্ড়ু কেবলমাত্র সংসদে মনোনীত নারী সদস্যের সংখ্যা ৩০ থেকে ৫০ জনে উন্নীত করা ছাড়া এপর্যন্ড় এসমস্ড় ঘোষণা কার্যকর করার জন্য কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অতি জর"রি প্রয়োজন হলো নারীর সম্পদে প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি করা। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সাধ্যমে নারীর এই শক্তি বৃদ্ধি করলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচাইতে বেশি অবদান রাখবে। কেননা এই উত্তরাধিকারের শক্তিতেই নারী একটি নির্বাচনী এলাকাতে তার আমিত্ব (belongingness) ফলাতে পারেন। নির্বাচনী এলাকাতে নারীর belongingness-এর অভাব নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বিশেষ অন্ড় রায়। কিন্তু এই অন্ড়রায়টি অপসারণের কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। নানা Tax incentive দেওয়ার মাধ্যমেও কন্যাকে পিতামাতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেটে সে লক্ষেও কোনো পক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

স্বাধীনভাবে চলাচলের শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি বিশেষ শর্ত। আর বাজেটের মাধ্যমে নারীকে এই শক্তির জোগান দেয়া সম্ভব। যেমন, নারীর চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন ক্ষেত্রের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব বরাদ্দ রাখা যায়; নারীকে পরিবহণ সুবিধা দিতে উৎসাহিত করার জন্য পরিবহণ ব্যবসায়ীদের কর-উৎসাহ প্রদান করা যায় ইত্যাদি। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেটে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

৩। মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে MDG'র লক্ষমাত্রা অর্জনের ব্যাপ্তি এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা

মাতৃমৃত্যু বাংলাদেশের একটি অতি পুরনো সমস্যা। তবে গত কয়েক দশকে এই সমস্যারও গতি প্রকৃতি বদলেছে। যেমন আজ নারীর শ্রমবাজারে প্রবেশের ফলে বৃত্তিয় ঝুঁকি মাতৃমৃত্যুর একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্বে ছিল না। বাংলাদেশের জন্য MDG'র ৫ নং লক্ষ্যমাত্রাটি ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) প্রতি লাখে ৫৭০ জন (১৯৯০ সালে) হতে ১৪৪ জনে নামিয়ে আনা। এই লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জনে বাংলাদেশ কতটা সফল হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে প্রবন্ধটির এই অংশে ।

সাম্প্রতিক তথ্য বিশেণ্ডষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জনে অনেকটা পিছিয়ে আছে। ২০০৭ সালের তথ্য অনুসারে, ১৯৯০ সালে দেশে মাতৃমৃত্যুর হার যেখানে প্রতি লাখে ৫৭৪ জন সেখানে ২০০২ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে হয় ৩৯১ জনে। এই হার বিচারে বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম প্রধান একটি দেশ। বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী এখনও প্রতি এক লাখ প্রসূতি মায়ের মধ্যে

৩৫১ জনই প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেন। হিসাব করলে দেখা যায়, দেশে প্রতি বছর ২৩,০০০ নারী মৃত্যুবরণ করেন প্রসবকালে। আরও ৬ লাখ নারী প্রসবজনিত নানা সমস্যায় ভোগেন যা তাদের উৎপাদনশীলতা খর্ব করে; সুস্থভাবে শিশু পালনের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়; এমনকি প্রসবজনিত সমস্যার কারণে অল্প দিনের মধ্যে তাদের মৃত্যুও হয়। এই অবস্থায় মাতৃমৃত্যু হ্রাসের MDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব। হিসাব করলে দেখা যাবে, যদি মাতৃমৃত্যু হ্রাসের বর্তমান হার বহাল থাকে এবং এই হার হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তবে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার দাঁড়াবে প্রতি এক লাখ প্রসূতি মায়ের মধ্যে ৩১০ জন যেখানে MDG'র লক্ষ্যমাত্রা হলো ঐ সময়ে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করে ১৪৪ জনে নামিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশে গত ১০ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বাঁচার সম্ভাবনা (Life Expectancy) বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে যে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে তা হলো বাঁচার সম্ভাবনায় জেন্ডার সমতা অর্জন। আজ বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় সমান হয়ে গেছে। Sample Vital Registration System 2006 অনুযায়ী বাংলাদেশের একজন পুরুষের জন্মের পর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা গড়ে ৬৪.৭ বছর যেখানে একজন নারীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা গড়ে ৬৫.৯ বছর। ১৯৯০ সালে নারী ও পুরুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল গড়ে যথাক্রমে ৫৫.৪ বছর ও ৫৬.৬ বছর। এখানে আশা করা যাচ্ছে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের ব্যাপারে বাংলাদেশ MDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক এগিয়ে যাবে। মাতৃমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। গত ১০ বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য অবস্থারও লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে যদিও জেন্ডার অসমতা রয়েছে ব্যাপকভাবে। কিন্তু অত্যন্ড় পরিতাপের বিষয় হলো, এই লক্ষণীয় উন্নতি হওয়ার পরেও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের ব্যাপারে বাংলাদেশ MDG'র লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।

বাংলাদেশের জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্য অবস্থা বেশ খারাপ। তবে বাংলাদেশী নারীর স্বাস্থ্য অবস্থা বাংলাদেশী পুরুষের চাইতে অনেক বেশি খারাপ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত রোগ ভোগের প্রকৃতি বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, রোগভোগে নারী পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বয়স-স্ড়র ভেদে রোগভোগের প্রকৃতি দারুণভাবে ভিন্ন হয়েছে। জনমিতিক সমীক্ষার ফলাফল হতে দেখা যায়, ১৫-৫৯ বৎসর বয়স দলে যে পুরুষরা আছেন তাদের স্বাস্থ্যের তুলনায় এই বয়সের বাংলাদেশী নারীদের স্বাস্থ্য অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। অথচ এই বয়সটি হলো একজন মানুষের জীবনের সবচাইতে কর্মঠ সময়। এই বয়সেই নারীরা অসুস্থ থাকেন বেশি আর এই বয়সসীমার মধ্যেই নারী মা হন। অতিরিক্ত রোগ প্রবণতা থেকে নারীকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকা জরুরি। কিন্তু গত দশ বছরের জাতীয় বাজেটে এধরনের কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। গত দশ বছরের বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছিল নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করে। বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো বিশেণ্ডষণ করে আরও একটি যে বিষয় গুরুত্ব বহন করে তা হলো, স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেটীয় বরাদ্দের অতি সামান্য অংশ নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ করা হয়। এই অংশ গত দশ বছরে মাত্র ০.৫ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

প্রসূতি নারীগোষ্ঠীর জন্য পৃথক বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি জর"রি। প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবাগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি জর"রি। কেননা সরকারি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং সরকারি হাসপাতালগুলো থানা, উপজেলা, এবং জেলাগুলোতে অবস্থিত। অথচ গত ১০ বছরের উন্নয়ন বাজেটে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে ঔষুধ, যন্ত্রপাতি, নার্স এবং ডাক্তারের তীব্র অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ডাক্তারের অভাব মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ। জানা গেছে, মহিলা ডাক্তারের অভাবে অনেক প্রসূতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন না। ফলে আজও শতকরা ৮৩টি শিশুর জন্ম হয় ঘরে গ্রাম্যধাত্রীর সহায়তায়। বেশিরভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) মাতৃমৃত্যুই ঘটে যখন অশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ঘরে প্রসব হয়। গর্ভকালীন সময়ে এবং প্রসবের পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য সেবার অভাবও মাতৃমৃত্যুর আর একটি শক্তিশালী কারণ। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার Health, Nutrution and Population Sector Programme (HNPSP) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার বিশেষ লক্ষ্যই হচ্ছে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি করা। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করছে, এর পরেও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। Bangladesh Demographic and Health Survey কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিককালের এক জরিপের তথ্য থেকে জানা যায়, ৪০ শতাংশ গর্ভবতী মহিলাই কোনো ANC গ্রহণ করেননি। যদিও HNPSP'র লক্ষ্য ছিল শতভাগ গর্ভবতী নারীকে এই প্রকল্পের সেবা প্রদান করা। এই জরিপের তথ্য আরও বিশেণ্ডষণ করলে এই ছবিটি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। দেখা যায়, মাত্র ২০ শতাংশ মহিলা নির্ধারিত ৪ বার ANC গ্রহণ করেছেন। PNC'র বেলায়ও একই ছবি পাওয়া যায়। মাত্র ২১ শতাংশ প্রসূতি নারী PNC গ্রহণ করেছেন।

প্রসূতিদের সহায়তা দেওয়ার জন্য কিছু Safety net প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে গত অর্থবছরের বাজেটগুলোতে। তার মধ্যে Maternal Health Voucher Scheme এবং Urban Primary Health Care Project অন্যতম। Maternal Health Voucher প্রকল্পটি HNPSP'র আওতায় দরিদ্র পরিবারের প্রসূতি মায়েদের লক্ষ্য করে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অন্ড়র্ভুক্ত প্রসূতি মায়েরা গর্ভকালীন সময়ে ৩ বার ANC পাবেন, নিরাপদ প্রসবের সুযোগ পাবেন, প্রসবের পর ৬ সপ্তাহের মধ্যে একবার PNC পাবেন, প্রসবজনিত সমস্যার জন্য চিকিৎসা পাবেন, পরিবহণের জন্য ৫০০ টাকার ভর্তুকি পাবেন, প্রসবজনিত বড় সমস্যা হলে জেলা হাসপাতালের সেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং গর্ভকালীন সময়ে মাসে ৩০০ টাকা করে পাবেন। এই প্রকল্পটির একটি ঝটিকা মূল্যায়নে দেখা গেছে, একমাত্র মাসে ৩৫০ টাকা করে পাওয়া ব্যতিত এই প্রকল্পের অন্যান্য সুযোগসুবিধাগুলো প্রসূতিরা সামান্যই গ্রহণ করেছেন। Urban Primary Health Care প্রকল্পটিও শিশু মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই হচ্ছে নারী ও শিশু। এই প্রকল্পটির কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বস্ড়ি এলাকা ভিত্তিক। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নারীরা অধিক সংখ্যায় সেবা গ্রহণ করতে আসে। কারণ হিসেবে তারা উলেণ্ডখ করেছেন বস্ড়ির সঙ্গে কেন্দ্রের নৈকট্য। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থার পুনর"দ্ধারের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং গত দুই বছর ধরে এই লক্ষে পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, ইতোমধ্যেই এই ক্লিনিকগুলোর জন্য ৪০ হাজার স্বাস্থ্য কর্মী নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এই ক্লিনিকগুলো গ্রামীণ নারীকে নিরাপদ প্রসবের সুযোগ প্রদান করতে পারবে অধিক হারে যেহেতু এগুলো গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় স্থাপিত হবে।

নারীর উপর সন্ত্রাস দমনের জন্য কয়েকটি বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক হেড কোয়ার্টারে One Stop Crisis Centre স্থাপন এবং এই সঙ্গে Hot Line System-এর সংযোগ। এসিড দগ্ধ মহিলাদের জন্য একটি Safety net প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও নারীরা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের স্বীকার হচ্ছেন।

৪। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দলিলের জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে জাতীয় বাজেটের অদক্ষতার পেছনে কারণসমূহ

৪.১। দারিদ্র্য ভোগে জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে জাতীয় বাজেটের অদক্ষতার পেছনে কারণসমূহ

দারিদ্র্য ভোগে জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে বাজেটীয় পদক্ষেপের অদক্ষতার পেছনে প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য বিমোচনে নারীকে লক্ষ্যভূত করা হয়েছে হাতিয়ার হিসাবে। নারীর নিজস্ব দারিদ্র্য বিমোচন প্রাধান্য পায়নি। তাই সম্পদ বরাদ্দ করা হলো নারীর মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করার জন্য। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে নারীকে স্বনিয়োজিত পেশায় নিয়োজিত করাই দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হল। কিন্তু দেখা গেছে, বহুক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্ম লাভজনক নয়, যেহেতু মহিলারা তাদের শিক্ষা, দক্ষতা এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশের অভাবের জন্য এই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার করেছে কেবল সনাতনী ক্ষেত্রে। তাছাড়া নারীকেন্দ্রীক কর্মসূচিগুলো নারীর প্রথাগত কাজকেই উৎসাহিত করেছে। এধরনের কাজের কেবল লাভজনকতাই কম নয়, কালের আবর্তে এধরনের কাজের বাজার সীমিত হয়ে যায়। ফলে চাহিদাও হ্রাস পায়। তাই শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও তাদের আয় বৃদ্ধি হয়নি উলেণ্ঢখযোগ্য হারে।

দারিদ্র্য ভোগে জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের জন্য গৃহীত বাজেটীয় পদক্ষেপগুলোর বেশিরভাগই খয়রাতি প্রকৃতির (welfare oriented) যেহেতু এগুলোর বেশিরভাগই গ্রহণ করা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায়। এই ধরনের পদক্ষেপগুলোতে ক্ষমতায়ন বিষয়টির চাইতে charity বিষয়টিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। আবার দেখা গেছে, যে প্রকল্পগুলো নারীর উন্নয়নে এবং ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন, শিল্প ক্ষেত্রে গৃহীত Women Entrepreneurship Development Program (WEDP) টির নারীর ক্ষমতায়নে উচ্চ ইতিবাচক প্রভাব ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি মাত্র ৪ বছর চলেছিল। আরও দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ডের সঙ্গে নারীর বাস্ড়ব প্রয়োজনের মিল থাকে না। এই কারণে অনেক প্রকল্পের কর্মকান্ডই নারীর জন্য কাঙ্ক্ষিত উপকার আনতে পারেনি। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর জন্য যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয় তার প্রত্যকটিই হয় দাতাগোষ্ঠী দ্বারা নির্বাচিত নয়তো সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত। নারীর প্রকৃত প্রয়োজন কি - তা জরিপ করে কখনও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্ড়বায়নের অদক্ষতার মূলে রয়েছে নারীর প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রমের অসঙ্গতি।

জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে জাতীয় বাজেটের একটি বিশেষ দুর্বলতা হলো, নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর স্বল্পতা এবং এই প্রকল্পগুলোর জন্য বাজেীয় বরাদ্দের অপ্রতুলতা (পাল-মজুমদার ২০০৮)। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা এতো ব্যাপক যে তা দূর করার জন্য অধিক সংখ্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা এবং প্রতিটি প্রকল্পে পর্যাপ্ত বাজেটীয় বরাদ্দ রাখা জরুরি। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেট বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায় কেবলমাত্র নারীকে লক্ষ্য করে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা এবং

বাজেটীয় বরাদ্দ দুইই ধীরে ধীরে কমে গিয়েছে যদিও মোট জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ২)। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যে মন্ত্রণালয়টির সৃষ্টি হয়েছিল মহিলা ও শিশুর মঙ্গলের জন্য, যে মন্ত্রণালয়টি দেশের ৭০ শতাংশেরও বেশি জনগোষ্ঠীকে (মহিলা+শিশু) প্রতিনিধিত্ব করে সেই মন্ত্রণালয়ের জন্য অতি নগণ্য পরিমাণ বরাদ্দ হয় জাতীয় বাজেটে। সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে, গত ১০ বছরের কোনো বছরেই এই মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট প্রস্ড়াবিত জাতীয় বাজেটের দেড় শতাংশের বেশি বরাদ্দ করা হয়নি। আবার এই নগণ্য পরিমাণ প্রস্ড়াবিত উন্নয়ন বরাদ্দ প্রতি বছরই সংশোধিত বাজেটে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ড় হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দ সংশোধিত বাজেটে কখনো ২০ শতাংশের বেশি হ্রাস পায়নি।

সারণি ২

জে"ার সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দের হার ২০০০/০১-২০০৯/১০

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (%)	জে"ার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচি		
		জে"ার বিবেচনায় না নেয়া উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (%)	জে"ার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (%)	কেবল নারীলক্ষ্যভুত উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (%)
২০০২-০৩	১০০	৬২.৩	৩৪.১	৩.৬
২০০৩-০৪	১০০	৬২.১	৩৪.৫	৩.৪
২০০৪-০৫	১০০	৫৭.৫	৩৯.৯	২.৬
২০০৫-০৬	১০০	৬৩.৫	৩৪.৭	১.৮
২০০৬-০৭	১০০	৫৭.৬	৪১.৩	১.৭
২০০৭-০৮	১০০	৫৭.৮	৪০.৬	১.৭
২০০৮-০৯	১০০	৬০.৩	৩৮.২	১.৫
২০০৯-১০	১০০	৫৭.৮	৪০.৬	১.৭
২০১০-১১	১০০	৫৪.৭৬	৪৩.৯৪	১.৩
২০১১-১২	১০০	৬৪.১৮	৩৪.৭৬	১.০৬

উৎস: Annual Development Programme 2001/02 – 2011/12, Planning Commission, GoB।

সারণি ৩

প্রস্ড়াবিত জাতীয় বাজেটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশ ২০০০/০১-২০০৯/১০

(সংখ্যাগুলো কোটিতে)

অর্থ বছর	মোট জাতীয় বাজেট (রাজস্ব + উন্নয়ন)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট (রাজস্ব+উন্নয়ন)	প্রস্ড়াবিত বাজেটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশ
২০০২-০৩	৪৩৬৩৫	১২৩	০.২৮
২০০৩-০৪	৪৯৭৯১	২৩৭	০.৪৭
২০০৪-০৫	৫৫৮৭৬	৫২৭	০.৯৬
২০০৫-০৬	৬২৬০৬	৬৪৩	১.০২
২০০৬-০৭	৬৭৬৮২	৭৪৯	১.১১
২০০৭-০৮	৭৭২৭১	৮২৫	১.০৬
২০০৮-০৯	৯০০১৩	১৩৫২	১.৫০
২০০৯-১০	১০৩৪১৩	১৩৪৫	১.৩০
২০১০-১১	১১৮১১৫	১২৪০	১.০৫
২০১১-১২	১৩৯১৭৩	১২৩৬	০.৮৯

উৎস: 1. Budget in Brief, various years, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh।

2. Budget Statement (various years) IMED. M/O Planning।

অবশ্য, কেবল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ বিচার করেই নারী ও পুর"ষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের জাতীয় অঙ্গিকারটির প্রতিফলনের ব্যপ্তি নির"পণ করা সঠিক হবে

না। কারণ, এই অঙ্গীকারটি কার্যকর করতে হলে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে এবং নারীকে লক্ষ্যভুত করে কেবল নারীর জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যেহেতু আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়টি বহুক্ষেত্রিক (multi-sectoral) এবং বহু মন্ত্রণালয়ের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নারী উন্নয়ন বিষয়টি দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই এখানে জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিচার করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কত বরাদ্দ করা হয়েছে এবং নারীর উপর আংশিক প্রভাব পরতে পারে- এমন প্রকল্পের জন্য কত বরাদ্দ করা হয়েছে তা বিচার করা হয়েছে। এই বিষয়টি সারণি ৪-এ বিচার করে দেখা যায় কেবলমাত্র নারীর জন্য গৃহীত এমন প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় প্রতিটি অর্থবছরেই কমে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্র পৃথকভাবে বিচার করলে আরও দেখা যায়, ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট ১০টি ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এই সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৬টি ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য বরাদ্দ একেবারেই তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন, শিল্প একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে এই বছর নারীর জন্য কোনো বরাদ্দই রাখা হয়নি। অথচ ২০০০-১০ অর্থবছরে শিল্প ক্ষেত্রে নারীর জন্য বরাদ্দ ছিল এই ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৭ শতাংশ। বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে ২০০০-০১ অর্থবছরে নারীর জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এই বছর এই ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোনো বরাদ্দই রাখা হয়নি।

সারণি ৪

বিভিন্ন অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা এবং উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দ ২০০২/০৩-২০০৯-১০

অর্থ বছর	প্রকল্পের সংখ্যা				মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			
	মোট উন্নয়ন বরাদ্দ	জেন্ডার বিবেচনায় না নেয়া উন্নয়ন কর্মসূচি	জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচি	কেবল নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচি	মোট উন্নয়ন বরাদ্দ	জেন্ডার বিবেচনায় না নেয়া উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	কেবল নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (%)
২০০২-০৩	১২৯৬	৯১৪	৩১৩	৬৯	১৯২০০.০০	১১৯৭১.১৪	৬৫৪০.০৮	৬৮৮.৭৮
	(১০০.০০)	(৭০.৫)	(২৪.২)	(৫.৩)	(১০০.০০)	(৬২.৩)	(৩৪.১)	(৩.৬)
২০০৩-০৪	১১৬৩	৮৩১	২৭৩	৫৫	২০৩০০	১২৬১২.৩৩	৭০০৮.৬৫	৬৭৯.০২
	(১০০.০)	(৭১.৫)	(২৩.৫)	(৪.৭)	(১০০.০০)	(৬২.১২)	(৩৪.৫৩)	(৩.৩৪)
২০০৪-০৫	৮৬৯	৫৯৯	২১৮	৫২	২১৮৯৭.০০	১২৫৯০.৬৭	৮৭৩৬.১৮	৫৭০.১৫
	(১০০.০)	(৬৮.৯)	(২৫.১)	(৬.০)	(১০০.০০)	(৫৭.৫০)	(৩৯.৯০)	(২.৬০)
২০০৫-০৬	৮৪১	৫৭১	২১৪	৫৬	২৪৫০০.০০	১৫৫৫৯.৭৩	৮৫১০.০০	৪৩০.২৭
	(১০০.০)	(৬৭.৯)	(২৫.৫)	(৬.৭)	(১০০.০০)	(৬৩.৫১)	(৩৪.৭৩)	(১.৭৬)
২০০৬-০৭	৮৮৬	৬০১	২৪৯	৩৬	২৬০০০.০০	১৫৩৩০.৯০	১০১৯২.২৬	৪৭৬.৮৪
	(১০০.০)	(৬৭.৮)	(২৮.০)	(৪০১)	(১০০.০০)	(৫৮.৯৭)	(৩৯.২০)	(১.৮৩)
২০০৭-০৮	৯৩১	৫৯৮	২৯৬	৩৭	২৬৫০০.০০	১৫৩০৪.২০	১০৭৪৭.১৩	৪৪৮.৬৮
	(১০০.০)	(৬৪.২)	(৩১.৮)	(৩.৯)	(১০০.০০)	(৫৭.৭৫)	(৪০.৫৬)	(১.৬৯)
২০০৮-০৯	৯০৪	৫৮৭	২৮৮	২৯	২৬৫০০.০০	১৫৯৭৫.৬০	১০১১৬.০৯	৪০৮.৩১
	(১০০.০)	(৬৪.৯)	(৩১.৯)	(৩.২)	(১০০.০)	(৬০.৩)	(৩৮.২)	(১.৫)
২০০৯-১০	৯৩১	৫৯৮	২৯৬	৩৭	২৬৫০০.০০	১৫৩০৪.১৯	১০৭৫০.৭	৪৪৫.০৬
	(১০০.০)	(৬৪.২)	(৩১.৮)	(৪.০)	(১০০.০)	(৫৭.৮)	(৪০.৬)	(১.৭)
২০১০-১১	৯১৬	৬১৮	২৭১	২৭	৩৮৫০০.০	২১০৮২.৯৬	১৬৯১৬.৭২	৫০০.৩২
	(১০০.০)	(৬৭.৫)	(২৯.৬)	(২.৯)	(১০০.০)	(৫৪.৭৬)	(৪৩.৯৪)	(১.৩০)
২০১১-১২	১০৩৯	৭০৪	৩০৫	৩০	৪৬০০০.০০	২৯৫২৩.৪৬	১৫৯৮৯.৪১	৪৮৭.১৩
	(১০০.০)	(৬৭.৭৬)	(২৯.৩৬)	(২.৮৯)	(১০০.০)	(৬৪.১৮)	(৩৪.৭৬)	(১.০৬)

Figures within parentheses indicate share in the total allocation।
উৎস: Annual Development Program 2002/03-2011/12 Planning Commission, GOB।

তবে, দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর উপর আংশিক প্রভাব পড়তে পারে এমন প্রকল্পের উপর, অর্থাৎ জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পের উপর বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে লক্ষণীয়ভাবে।

২০০০-০১ অর্থবছরে এই ধরনের প্রকল্পের উপর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় ৩১ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪১ শতাংশে। এখানে ধারণা করা যেতে পারে, নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নীতি গ্রহণ করার ফলে নারীর জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ না করে নারীকে মূল স্রোতধারায় প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে, নারীর উপর আংশিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্রকল্পগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। যার ফলে পুর"ষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে এ জাতীয় প্রকল্প হতে নারী অতি সামান্য অংশই অর্জন করতে পেরেছে। নারীকে পুর"ষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার আগেই তাকে পুর"ষের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অসম প্রতিযোগীতায় হেরে হেরে নারী আরও এক ধাপ জে"ার বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

জে"ার অসমতা দূরীকরণে জাতীয় বাজেটের আর একটি প্রধান দুর্বলতা হলো বাজেটীয় বরাদ্দের অদক্ষ ব্যবহার। দেখা গেছে, প্রায় কোনো বছরই পুরো বরাদ্দ খরচ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর বেশির ভাগই বৈদেশিক সাহায্য ও থোক বরাদ্দ নির্ভর যা অনেক ক্ষেত্রেই অদক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয়। যার জন্য নারীর জন্য যতটুকু নগণ্য পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার থেকেও পুরো উপকার তারা পাননি।

৪.২। শিক্ষায় জে"ার অসমতা দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের MDG লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে শিক্ষা বাজেটের দুর্বলতা

গত কয়েক বছরে নানা বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্ড়রে জে"ার অসমতা দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষা সমতা নারীকে শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য যথেষ্টভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারেনি। অথচ শিক্ষা শ্রম বাজারে, বিশেষ করে লাভজনক শ্রম প্রবেশের জন্য একটি শক্তিশালী উৎপাদক। এই ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে যে ধরনের শিক্ষার চাহিদা রয়েছে সে ধরনের শিক্ষা নারীরা পাননি। আর একটি কারণ হলো, অধিক হারে মাদ্রাসা শিক্ষায় নারীদের প্রবেশ। মাদ্রাসা শিক্ষা নারীর চাকুরির বাজার সীমিত করে। শিক্ষা নারীর মজুরির হারও বৃদ্ধি করতে পারেনি। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত ৭ বছরে গার্মেন্ট শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ হারে। অথচ সেই সময়ে নারী গার্মেন্ট শ্রমিকের শিক্ষা স্ড়র বৃদ্ধি পেয়েছে তৃতীয় শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ড় (পাল-মজুমদার এবং বেগম ২০০৬)। এই অতিরিক্ত তিনটি শিক্ষা বছরের জন্য তাদের বেতন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল ৩০ শতাংশ (প্রতি বছর শিক্ষার জন্য ১০ শতাংশ হারে)।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উৎপাদক। অথচ এই শক্তিশালী উৎপাদকটি অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট নারীকে কোনো সহায়তাই প্রদান করেনি। এই উৎপাদকটি অর্জনের জন্য নারীকে সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় বাজেটে কেবল নারীর জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা জর"রি ছিল। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেটে এমন ধরনের কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। যার ফলে দেখা গেছে, সরকারি যে Vocational Instituteগুলো আছে তাতে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ হচ্ছে মহিলা। মেয়েদের জন্য আলাদা Vocational Training Institute না থাকার জন্য তাদের enrollment এত কম হয়েছে। সামাজিক রক্ষণশীলতা বিশেষ করে পর্দা প্রথার কারইে adolescent বয়সের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে যেতে পারে না। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (Dircetorate of Technical Education)

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে ভোকেশনাল ও কম্পিউটার কোর্স চালু করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, এই কোর্স ঢাকা শহরের কয়েকটি মহিলা বিদ্যালয় ও কলেজ ছাড়া আর কোথাও কোনো মহিলা বিদ্যালয় বা কলেজে চালু করা হয়নি।

শিক্ষায় জেন্ডার অসমতা দূরীভূত না হওয়ার পিছনে সবচাইতে বড় কারণটি হচ্ছে বরাদ্দ সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নীতির মধ্যে বিদ্যমান ফারাক। নীতি হচ্ছে নারীর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার। এই জন্য শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হলো কেবল প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি এবং বৃত্তির জন্য। এই বরাদ্দ নারীর মধ্যে শিক্ষা অভাবের মাত্র একটি কারণ যা হলো দারিদ্র্য তা কিছু মাত্রায় দূর করেছে। যার জন্য নারী শিশুকে স্কুলে ভর্তি করতে পিতামাতার কোনো অসুবিধা হয়নি। এজন্য স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে সমতাও অর্জন করা হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত এবং স্কুলের প্রতিটি গ্রেড সফলভাবে শেষ করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা যে একটি বড় প্রতিবন্ধক তা নীতি নির্ধারকগণ অনুধাবন করতে খুব সামান্যই সফল হয়েছেন। তাই মেয়েদের অধ্যয়নকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো সহায়ক ব্যবস্থা বাজেটে গ্রহণ করা হয়নি। যেমন শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দের মাধ্যমে পরিবহণ সুবিধা প্রদান করে যদি মেয়েদের স্কুলে আসা যাওয়ার পথের নিরাপত্তাহীনতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির হার অনেক বৃদ্ধি পেত। তাছাড়া বাসস্থানের কাছাকাছি স্কুল থাকলেও তাদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেত। মাধ্যমিক স্তরের মেয়েরা adolescent বয়সের হয়। তাই বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এই বয়সের মেয়েদের পক্ষে ছেলেদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করা বেশ অসুবিধাজনক। কিন্তু কেবল মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক স্তরের স্কুল স্থাপনের জন্য শিক্ষা বাজেটে তেমন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৪.৩। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে জাতীয় বাজেটের ব্যর্থতার কারণসমূহ

মাতৃমৃত্যু বাংলাদেশের একটি অতি পুরনো সমস্যা। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট ছিল এবং জাতীয় বাজেটেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে এই সমস্যার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়নি সঠিকভাবে। যেমন, মাতৃমৃত্যু বহুলাংশেই নির্ভর করে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর এবং নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য যে পুরুষের চাইতে অনেক খারাপ এই সত্যটি অনুধাবন করে জাতীয় বাজেটে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা জরুরি ছিল। কিন্তু এই সত্যটি বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময়। তাছাড়া সময়ের অতিক্রমনে মাতৃমৃত্যুর সমস্যার গতি প্রকৃতি এবং কারণও যে বদলেছে - এই সত্যটিও বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময়। যেমন, আজ নারীর শ্রমবাজারে প্রবেশের ফলে বৃত্তিয় ঝুঁকি মাতৃমৃত্যুর একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্বে ছিল না। নারীগোষ্ঠী গত কয়েক বছর ধরেই নারীর বৃত্তিয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি (occupational health hazard) সমস্যা সমাধানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী করে আসছে। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেটে এই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিটি বাজেটেই সনাতনীভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জাতীয় বাজেটে গর্ভবতী নারীকে প্রসবজনিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করার জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো গর্ভবতী নারীর বাস্ড়ব প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে না। যেমন, দেখা গেছে গর্ভবতী নারীকে নিরাপদ প্রসবের সুযোগ দেওয়ার জন্য গত দুই অর্থবছরের বাজেটে যে Maternal Health Voucher Schemeটি গ্রহণ করা হয়েছে তা গর্ভবতী নারীর প্রকৃত প্রয়োজনকে মেটাতে পারছে না। কেননা, দরিদ্র গর্ভবতী নারীর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হলো নিরাপদ প্রসবের সুযোগ পাওয়া। দেখা গেছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীকে মাসে মাসে যে অর্থ দেওয়া হয় তার খুব সামান্য অংশই গর্ভবতী নারী তার নিজের জন্য খরচ করেছে। আরও দেখা গেছে, দূরত্বের কারণে অর্ধেকেরও বেশি এই সুযোগ পাওয়া গর্ভবতী নারী হসপিটালে যাননি। অথচ এই প্রকল্পের আওতায় প্রসূতি নারীকে হসপিটালে যাতায়াত খরচ বাবদ ৫০০ টাকা পর্যন্ড় দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ হলো বাল্য বিবাহ এবং বাল্য অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া। UNICEF-এর State of the World's Children 2009 অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬৪ শতাংশ নারীর বিবাহ হয় ১৮ বৎসর বয়সে পৌঁছার পূর্বেই, যদিও ১৯৮৪ সালেই বাংলাদেশ সরকার নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য্য করেছিল ১৮ বছর এবং পুর"ষের জন্য ২১ বছর। বাল্য বিবাহ কেবল বাল্য বিবাহেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। দেখা গেছে, যাদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয় তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশই প্রথম মা হয় ১৯ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই। UNICEF 2007 রির্পোট অনুযায়ী ১৯ বছরের আগে যারা মা হয় তাদের মৃত্যু হার ২০-২৪ বছর বয়সে যারা প্রথম মা হয় তাদের মৃত্যু হারের চাইতে পাঁচগুণ বেশি। অথচ বাল্য বিবাহ এবং বাল্যমাতা হওয়ার প্রবণতা রোধ করার জন্য কোনো কার্যকর বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মনে করা হয়েছে, নারীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি হলেই বাল্য বিবাহ বন্ধ হবে। তাই নারীর জন্য শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই গত কয়েক বছরের বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাল্য বিবাহের জন্য নারীর নিরাপত্তাহীনতা যে একটি বড় কারণ, এই সত্যটি অনুধাবন করা হয়নি বাজেট প্রণয়ন করার সময়। তাই নারীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি

যৌতুক প্রথাও বাল্য বিবাহের একটি কারণ। এই প্রথা রোধ করার জন্য যৌতুক বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এই আইন কার্যকর করার জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। নারীর নি" শিক্ষা স্ড়রও বাল্য বিবাহ এবং বাল্য মাতা হওয়ার জন্য শক্তিশালী দায়ী উৎপাদক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্ড়রে ছাত্রছাত্রীদের তালিকাভুক্তিতে জে"ার অসমতা দূর হলেও শিক্ষা সমাপ্তিতে রয়েছে জে"ার অসমতা। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষার গুণাগুণ বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষামান অতি নি"। আজও ৭ বছরের ঊর্ধ্ব মোট নারী জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই সাক্ষরহীন। দেখা গেছে, যে মেয়েরা ১৯ বছর বয়সে পৌঁছার পূর্বে গর্ভবতী হয়েছে তাদের মধ্যে অর্ধেকেরই কোনো শিক্ষা নেই (UNICEF এর State of the World's Children 2009)। দারিদ্র্যও মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ। নানা বাজেটীয় পদক্ষেপের কারণে দারিদ্র্য অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও এখনও দারিদ্র্য বিস্ড়ৃত এবং গভীর।

৫। সুপারিশসমূহ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, MDG'র জে"ার লক্ষ্যগুলো বাংলাদেশ কর্তৃক যথাযথভাবে অর্জন না করার পেছনে একটি মূল কারণ হলো দেশের জাতীয় বাজেটে এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

গ্রহণে ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা অপসারণ করে আগামী তিন বছরে কিভাবে MDG'র জোর লক্ষ্যগুলো অর্জন করা যায় এবং আগামী বাজেটে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি নিে তার জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়ছে।

ক) সম্পদ এবং অর্থের উপর নারীর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপসমূহ

এই প্রবন্ধের আলোচনা থেকে দেখা যায়, MDG'র জোর লক্ষ্যগুলোর নির্ধারিত মাত্রায় পৌঁছাতে বাংলাদেশের ব্যর্থতার পেছনে একটি মূল কারণ হলো সম্পদের উপর নারীর অসম মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ। নারীর ক্ষমতাহীনতার পেছনেও একই কারণ প্রভাবশালী। নারীর ক্ষমতাহীনতা প্রকারান্ড়রে আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে জোর অসমতর জন্য দায়ী। তাই MDG'র জোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য জরুরি প্রয়োজন হলো সম্পদের উপর নারীর মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা। সম্পদের উপর নারীর অসম মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ জনগোষ্ঠীর দুই প্রধান ধর্মাবলম্বীদের বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনের কারণে। এই আইনের পরিবর্তন হলে সম্পদের উপর নারীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যেহেতু ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশীদের জন্য ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন বিষয়টি অত্যন্ড় স্পর্শকাতর বিষয় সেহেতু অদূর ভবিষ্যতে উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে সম্পদের উপর নারীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে আইন প্রণয়ন করে ঠিক একইভাবে তার সকল নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করতে পারে যা অন্যান্য দেশে আছে। গত প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠী সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য একটি অভিন্ন উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের দাবী করে আসছে। কিন্তু এখন পর্যন্ড় কোনো নীতিনির্ধারক নারীগোষ্ঠীর এই দাবী বিবেচনায় গ্রহণ করেননি।

তবে দেশের কোনো বঞ্চিত গোষ্ঠীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার জন্য দেশের জাতীয় বাজেট হচ্ছে সরকারের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বিভিন্ন বাজেটীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার সম্পদের উপর এদেশের সম্পদবঞ্চিত নারীগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে পারে। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে যেহেতু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী দলিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৮)'র অনুযায়ী দেশের নারী গোষ্ঠী অথবা যেকোনো পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর উন্নয়নের স্বার্থে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে কোনো কিছুই নিরস্ড় করতে পারবে না। নারী গোষ্ঠীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার জন্য নিচের বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে।

ক) নারীর উপার্জন, সম্পত্তি এবং পুঁজির উপর কর মওকুফ করতে হবে;

খ) আগামী বাজেটে কালো টাকা সাদা করা অথবা অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ করার সুযোগ প্রদান করা হলে নিম্নের gender শর্তগুলো জুড়ে দিতে হবে:

১) অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হবে যদি নারীর নামে প্রদর্শন করা হয়;

২) অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হবে যদি নারীবান্ধব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। যেমন- কর্মজীবী নারীর জন্য হোস্টেল তৈরি, নারীর জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, গার্মেন্ট শ্রমিকের জন্য বহুতল আবাসন তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্র।

গ) একটি বাড়ি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের নামে নথিভুক্ত করার জন্য এবং উভয়ের নামে সম্পত্তি কর প্রদান করার জন্য কাঠোর নিয়ম থাকতে হবে।

ঘ) মা/স্ত্রী/কন্যা/পুত্রবধুকে যে সম্পত্তি উপহার হিসেবে দেওয়া হয় সে সম্পত্তি হতে Gift tax মওকুফ করতে হবে।

ঙ) একটি স্থাবর সম্পত্তি মা/স্ত্রী/কন্যা/পুত্রবধুর নামে নথিভুক্ত (registration) হলে নথিভুক্তির ফি পুর"ষের নামে নথিভুক্তির ফি'এর তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম রাখতে হবে।

চ) নারী মালিকাধীন এবং পরিচালনাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন Tax break অথবা Tax holiday সুবিধা দিতে হবে।

ছ) বাণিজ্য এবং Tariff ব্যবস্থায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু affirmative action গ্রহণ করতে হবে।

জ) নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য লাভজনকভাবে বাজারজাত করার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ঝ) সম্পদে নারীর প্রবেশ সহজ করার জন্য monetary ক্ষেত্রেও কিছু বাজেটারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে রাজস্ব বাজেটে। যেমন:

১) নারীকে যে ব্যাংকগুলো জামানত ছাড়া বড় ঋণ দেবে সেই ব্যাংকগুলোকে কিছু কর উৎসাহ (tax incentive) দিতে হবে।

২) নারীর জন্য একটি পৃথক ব্যাংক স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন উৎস হতে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রবাহ উৎসাহিত করার জন্য কর উৎসাহ (tax incentive) দিতে হবে।

৩) প্রবাসী ব্যাংক স্থাপনের যে পরিকল্পনা চলছে সেখানে নারী প্রবাসী বিনিয়োগকারীকে বিশেষ বাজেটীয় সুবিধা প্রদান করতে হবে।

খ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতায় জে"ার অসমতা দূর করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতায় জে"ার অসমতা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে:

ক) নারীকে উচ্চ প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য কর উৎসাহ প্রদান করে বেসরকারি খাতকে প্রণোদিত করতে হবে।

খ) তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের কর উৎসাহ প্রদান করতে হবে যাতে তারা গ্রামে গ্রামে তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে প্রণোদিত হন।

গ) তথ্যপ্রযুক্তি (IT) শিক্ষা দক্ষতার সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য নারীর ইংরেজি শিক্ষাকে রাজস্ব সুবিধা প্রদান করে বেসরকারি খাতকে প্রণোদিত করতে হবে।

ঘ) ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের এম.পি.ও ভুক্তি ত্বরান্বিত করে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে।

ঙ) গত কয়েক বছর ধরে শূন্য শুল্কের কারণে কম্পিউটারের সুলভ প্রাপ্যতা নারীর কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধি করে তাদের তথ্য সম্পদে প্রবেশ করাকে কিছুটা সহজ করে করেছে। তাই তথ্য সম্পদে জে"ার অসমতা দূর করার জন্য আগামী অন্ড়ত ৫ বছর ধরে কম্পিউটারের উপর শূন্য শুল্ক ব্যবস্থাটি বহাল রাখতে হবে।

চ) "১০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসূচিকে ১০০ দিনের নিশ্চিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" তে রূপান্ড়র করতে হবে।

ছ) রাজস্ব বাজেটে একটি থোক বরাদ্দ (Block allocation) রাখতে হবে। মেধাবী নারী ছাত্রীগণ যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য থোক বরাদ্দ হতে বৃত্তি প্রদান করতে হবে।

জ) অর্থমন্ত্রী কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের ঘোষণা দ্র"ত বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

ঝ) ্লাতক স্ড়র পর্যন্ড় নারী শিক্ষা অবৈতনিক করার উদ্যোগটি উচ্চ শিক্ষায় জে"ার অসমতা দূর হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে নিশ্চিতভাবে। এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য নারী ছাত্রদের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো প্রদানের জন্য উন্নয়ন বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. নিরাপদ বাসস্থান।

২. নিরাপদ পরিবহণ।

৩. কোনো পরিবহণ ব্যবসায়ী কেবল নারীর জন্য বাস পরিবহন ব্যবস্থা চালু করলে তাকে শুল্ক মুক্ত বাস আমদানি করার সুযোগ দিতে হবে এবং সেই বাসের আয়কেও কর মুক্ত রাখতে হবে।

৪. সর্বোপরি নারী ছাত্রদের সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রশাসন ক্ষেত্রের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব বরাদ্দ রাখতে হবে।

শ্রমবাজারের অসমতা দূর করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ

নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ নিরাপদ ও লাভজনক করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে:

ক) উন্নয়ন বাজেটে কেবল দরিদ্র নারীর জন্য প্রকল্প নয় অদরিদ্র নারীর জন্যও প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। কারণ দরিদ্র নারীদের লাভজনক ব্যবসা গ্রহণের সক্ষমতা বেশি এবং তাদেরও কর্ম সৃষ্টি করার সক্ষমতা রয়েছে।

খ) নারী উদ্যোক্তাদের সর্বপ্রকার অসুবিধা দূর করতে হবে।

গ) নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহায়ক সুবিধাদি প্রদান করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) নারী শ্রমিকদের সুলভে স্বাস্থ্য সুযোগ প্রদানের জন্য সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য নারী শ্রমিকদের নাগালের মধ্যে আনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) "নিশ্চিত কর্মসূচি"র মাধ্যমে নারীর জন্য কর্ম সৃষ্টি করতে হবে। এই কর্মসূচি'র মাধ্যমে প্রদত্ত কর্মের মজুরি কৃষিতে বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরির সমান করতে হবে। কেননা এই কর্মের মজুরি ন্যূনতম মজুরির কম হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এই কর্মসূচিকে কার্যকর করা যায়নি। তাছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মের মজুরি ন্যূনতম মজুরির সমান হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে।

মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের MDG*'র লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপসমূহ*

মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের MDG'র লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য জর"রি প্রয়োজন হলো বাজেটীয় পদক্ষেপগুলোর দুর্বলতা অপসারণ করা। এই লক্ষ্যে নিম্নে বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

ক. স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

খ. নারীর জন্য শুধুমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নয়, সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য পৃথক প্রকল্প করতে হবে।

গ. প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ডাক্তারের সেবা নিশ্চিত করার জন্য মহিলা ডাক্তারের বেতন বৃদ্ধি করা, তার বাসস্থান এবং চলাফেরার নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে জর"রি ধাত্রী সেবা কার্যক্রম চালু করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।

ঙ. সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে যথাযথভাবে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা এবং প্রসূতি সেবা পৌঁছানোর জন্য Gender poverty mapping করা জর"রি এজন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা।

চ. নারীর বৃত্তিয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি (occupational health hazard) সমস্যা সমাধানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ছ. ধাত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই লক্ষে সরকার এবং এনজিও সহযোগে যে গ্রাম্য ধাত্রী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি একসময় চালু ছিল তা পুনর"দ্ধার করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি আধুনিক করার জন্যও বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জ. HNPSP'র আওতায় সরবরাহকৃত সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঝ. বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য পিতামাতাকে বাজেটীয় প্রণোদনা দেওয়া।

মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস কার্যকরভাবে করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যুক্ত করতে হবে:

১. ANC এবং PNC সেবা প্রয়োজনে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা;

২. ঘরে ঘরে ANC এবং PNC এর মনিটর করার ব্যবস্থা রাখা;

৩. মহিলা ডাক্তারের সেবা নিশ্চিত করা;

৪. প্রসবকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী সেবা সরবরাহ করা;

৫. নিরাপদ মাতৃত্ব এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে তৃণমূলভিত্তিক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৬. প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সম্বন্ধে তৃণমূলভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৭. এইসঙ্গে ভ্রাম্যমান ক্লিনিক ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন;

৮. Maternal Health Voucher Scheme টি এইসঙ্গে যুক্ত করা।

MDG'র লক্ষ্য অর্জনে নারীর ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক অপসারণের জন্য নিম্নলিখিত বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে:

১. আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য প্রশাসনে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

২. সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা। এই ধরনের পুলিশ ভারতে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

৩. ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা, বিশেষ করে ছাত্রীদের নিরাপদ পরিবহণ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

৪. যৌন হয়রানী বন্ধ করার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা যেহেতু যৌন হয়রানী মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ।

৫. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ভিসেরা (Viscera) পরীক্ষা, উন্নত ফরেনসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (২০১০): জাতীয় বাজেট ও নারীর এমডিজি, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

MoF (Reviews Years) *Bangladesh Economic Review* (2008, 2009 and 2010): Economic Advisers Wing, Finance Division, Ministry of Finance, GOB.

Paul-Majumder (2009): "Gender Impact Assessment of the DBSM Programme Bangladesh," A Study Conducted by Development Alternative Inc (DAI) in Cooperation with AC Nielsen Bangladesh Ltd.

Paul-Majumder (2005): *National Education Budget of Bangladesh and Empowerment of Women*, Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS), Bangladesh.

Paul-Majumder (2006): *Role of National Budget in Developing Entrepreneurship among Women of Bangladesh*, Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS) and Institute for Environment & Development.

Paul-Majumder and Begum, (2006): *Engendering Garment Industry, The Bangladesh Context,* UPL, Bangladesh.

UN: (2010): Millennium Develoment Gloals: At a Gance. Department of Public Information. Updated.

BBS (Reviews Years) *Statistical Year Book of Bangladesh*, 2000-2011.